Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৩ নভেম্বর, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ২২ নভেম্বর, ২০২১, সোমবার, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮

উদয় সরকারের স্মরণসমাবেশ ৭ ডিসেম্বর সগড়াইয়ে বক্তা সূর্যকান্ত মিশ্র

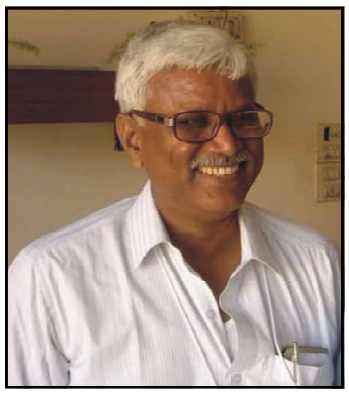

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ নভেম্বর : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন সভাধিপতি উদয় সরকার স্মরণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে সগড়াইয়ে ৭ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটায়। সমাবেশ প্রয়াত এই কৃষক নেতাকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখবেন দলের পলিট ব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। সমাবেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

সিপিআই(এম)-এর সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ নভেম্বর : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান ২৫তম জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক সম্মেলনগুলি চলছে। সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর এরিয়া কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন মৃদুল সেন নগর, দিলীপ দুবে মঞ্চ বর্ধমান টাউনহলে ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিপিআই(এম) প্রাদেশিক কমিটির সদস্য অমল হালদার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন তরুণ রায়। প্রতিবেদনকে আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেন ৩৩ জন প্রতিনিধি। মোট ৩০৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। সম্মেলন থেকে ৪ জনের বিশেষ আমন্ত্রিত সহ ২১ জনের নতুন এরিয়া কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন তরুণ রায়।

সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন ২০ নভেম্বর কালিশঙ্কর পাল, অশোক ব্যানার্জী নগর, নিরঞ্জন সরকার মঞ্চ বর্ধমান টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক নজরুল ইসলাম, প্রতিবেদনের উপরে আলোচনায় অংশ নেন ৩৪ জন প্রতিনিধি। মোট ৪৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। সম্মেলন থেকে ৪ জন বিশেষ আমন্ত্রিত সহ ২১ জনের নতুন কমিটির সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন নজরুল ইসলাম।

অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৫ নভেম্বর : আশংকা ছিল, সত্যি হলো। ফের নিম্নচাপের জেরে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে চাষিরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার শস্যভাণ্ডার নামে পরিচিত। কিন্তু ধারাবাহিক বর্ষণে পদে পদে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শস্যভাণ্ডারের চাষিদের।

প্রসঙ্গত, জুলাই-আগস্টে মাসের টানা বর্ষণে, কার্যত বনলতার রূপ নিয়েছিল কৃষি জমি। বিঘের পর বিঘে প্লাবিত হয়েছিল সদ্য রোপণ করা ধানের জমি। নষ্ট হয়েছিল একাধিক বিজতলা ও ধানের চারা। আর্থিক

ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও, সেই জমিতে আবারও নতুন করে ধান চাষ করেছিলেন চাষিরা। তবে শেষ রক্ষা

—এরপর চারের পাতায়

কালা কৃষি-আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা

জয় গণতন্ত্রের, উৎসবে কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ নভেম্বর : তিনটি কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এক বছর ব্যাপী আন্দোলনের জয় হলো ৯৫ কোটি কৃষকের। গুরুনানক এর জন্মদিনে হাঁটু গেড়ে নতি স্বীকার করলো মোদী সরকার। কৃষকদের কাছে মোদির দর্প চূর্ণ হওয়ার খবর চাউর হতেই সারা জেলায় কৃষক সভার উদ্যোগে জেলার প্রতিটি মহকুমা, ব্লকে উৎসবে মেতে ওঠে কৃষকরা।

আন্দোলনরত কৃষকদের অভিনন্দন জানিয়ে ১৯ নভেম্বর বিকেলে সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কার্জনগেট চত্বরে করা হয় জমায়েত কর্মসূচি। পরে বিজয়ী কৃষকদের সংহতি জানিয়ে কার্জনগেট চত্বর থেকে শুরু করে বি সি রোডে মিছিল করা হয়।

তিনটি কৃষি আইন যথাক্রমে—১) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন ২) অত্যাবশ্যক পণ্য আইন এবং ৩) কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং কৃষি পরিষেবা সংক্রান্ত কৃষক চুক্তি আইন। এই তিন কৃষি আইন প্রণয়ণের পরই সেগুলির বিরোধিতা করে তীব্র প্রতিবাদ জানান ভারতের কৃষকেরা।

গুরু নানকের জন্মদিনেই বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। আজ সকাল থেকে সিঙ্ঘু সীমান্তে বইছে খুশির হাওয়া, বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে কেন্দ্র, আন্দোলনকারীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল, কিন্তু কৃষি আইনের সুফলের কথা আমরা কয়েকজন কৃষককে বোঝাতে পারিনি’’।

কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার। একান্ত আলাপচারিতায় জানান, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় ভারতের কৃষকদের নৈতিক জয় হল। গোটা একটা বছর ধরে এই আন্দোলন

—এরপর চারের পাতায়

সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-২ এরিয়া সম্মেলনের প্রকাশ সমাবেশ

‘নতুন চিঠি’র জন্য ১০ হাজার টাকা তুলে দিলেন এক প্রবীণ বামপন্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ নভেম্বর : কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের একই এজেন্ডা—লালঝাণ্ডাকে শূন্য করো। এজন্য রাজ্য, দেশ, বিদেশ সর্বত্র এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। যাতে করে কোনোদিন খেটে খাওয়া মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কথাগুলি বলেন ডি.ওয়াই.এফ.আই রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী। সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-২ এরিয়া সম্মলনে প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। নবস্থার আউসায় ভিড়ে ঠাসা মানুষের সামনে মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন—এখন থেকেই বুথভিত্তিক সংগঠনকে শক্তশালী করুন। লালঝাণ্ডাকে ওরা ভয় করে। কৃষক, খেতমজুর, রাইসমিল শ্রমিকদের জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। তৃণমূল, বিজেপির সমস্ত ভাগ করার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে ২০১১ সালে পালা পরিবর্তনের পর থেকে শত চেষ্টা করেও এই এলাকায় গরিব মানুষ-এর জোটকে ভাঙতে পারেনি। লালঝাণ্ডা দিয়ে শাসকের সন্ত্রাসকে রুখে দিয়েছে। আজও গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জোটকে মেপে চলে শাসকদলের দাদারা। গত তিন বছর ধরে খেতমজুর আন্দোলন সফল হয়েছে।

সম্মেলন উপলক্ষে সারা এলাকায় লালঝাণ্ডায় সেজে ওঠে। উৎসবের মেজাজে সম্মেলন সফল হয়। সমাবেশে গরিব ও মহিলাদের উপস্থিতি সংগঠনকে অক্সিজেন যোগায়।

১৭ নভেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশে নবস্থা অঞ্চলের প্রবীণ বামপন্থী কর্মী গোপাল চন্দ্র দে মীনাক্ষী মুখার্জীর হাতে ‘নতুন চিঠি’-র তহবিলে ১০,০০০ টাকা তুলে দেন। আজ বর্ধমান সদর-২ এরিয়া কমিটির প্রকাশ্য সমাবেশে শারদীয়া নতুন চিঠিতে প্রকাশিত রমাকান্ত পাঁজা-র কবিতা পাঠ করার জন্য মীনাক্ষী মুখার্জী ও অমল হালদার সংবর্ধিত করেন। চাকুন্দি গ্রামের প্রবীণ সিপিআই(এম) কর্মী আজও বুক চিতিয়ে শাসক দলের চোখ রাঙ্গানির বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলেন। শত আক্রমনেও মাথা নত করেনি। স্ত্রী বিয়োগের পর স্ত্রী-র সম্মানার্থে নতুন চিঠি-কে ১০০০০ এবং ‘গণশক্তি’-কে ৪০০০০ টাকা যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জির হাতে তুলে দেন। এলাকার মানুষ গোপালবাবুর এই উৎসর্গকে গভীয় প্রশংসা জানান। নতুন চিঠি পরিবার তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, সভার সভাপতিত্ব করেন তপন বোস। সম্মেলন থেকে নতুন এরিয়া কমিটির সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন জহর দত্ত।

অভিনয় ছেড়ে মৎস্য ব্যবসায় মেমারির তরুণ অভিনেতা অরিন্দম প্রামাণিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ নভেম্বর : অরিন্দম প্রামাণিক, যার নেশা অভিনয়। ধীরে ধীরে তা পরিণত হতে থাকে পেশায়। কিন্তু করোনার অতিমারি পরিস্থিতির কারণে কাজ হারিয়ে এক প্রকার বাধ্য হয়েই পেশার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

বিশিষ্ট অভিনেতা চন্দন সেনের নাট্য গ্রুপে মঞ্চ অভিনয় দিয়ে শুরু হয় তার অভিনয় জীবনের যাত্রা। এরপর ‘ভালোবাসা ডট কম’, ‘সুবর্ণলতা’ সহ একের পর এক ধারাবাহিকে অভিনয় করে মানুষের মন জয় করেছিলেন মেমারির অরিন্দম। ‘তোরনাম’ চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে অরিন্দমের বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ। কিন্তু করোনার প্রথম ধাক্কায় কার্যত দিশাহীন হয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরাও পড়ে ছিলেন সমস্যায়। বাবা-মা ও স্ত্রীর মুখে অন্ন তুলে দিতে অরিন্দম ফিরে আসেন মেমারির নিজের বাড়িতে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে শুরু করেন অন্য পরিকল্পনা। মেমারি স্টেশন সংলগ্ন স্টেশন বাজার এলাকায় শুরু করেন মাছের ব্যবসা। অল্প সময়ের মধ্যে সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। ব্যবসা একটু বড় হতেই, শুরু করেন অন্য পরিকল্পনা। শহরের মাঝে এক টুকরো হৃদস্পন্দন তৈরি করেন। তার নাম দেন ‘বাগান’, যেটি হল শহর মেমারির মধ্যে নার্সারি। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। চলতি সাধারণ মানুষের প্রতিনিয়ত আনাগোনা, ফাঁকা পেলেই অরিন্দমের সবুজ ‘বাগানে’ একটু ঢুঁ মেরে যাওয়া। হাতে তুলে নেওয়া বিভিন্ন রকমের গাছ।

অরিন্দমের কথায়, করোনা পরিস্থিতিতে এই দুই ব্যবসায়ই তার পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। তাই এখন তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এই নার্সারি এবং মাছের ব্যবসা। কিন্তু যদি কখনো আবারো অভিনয়ের সুযোগ পান তবে আবারও অভিনয় করবেন তিনি।

এদিন তার বাগানে আসা দুই ক্রেতা শওকত আলী ও নাসিরুল মল্লিক বলেন, অরিন্দমদা আমাদের ইনস্পিরেশন। অভিনয় এবং ব্যক্তিগত ব্যবসা করা দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও যেভাবে শহরের অভ্যন্তরে সবুজের সমারোহ তৈরি করে মানুষের নজর কেড়েছেন তাতে আমরা অভিভূত। তাই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র নিয়োজিত থাকলেও, একটু সময় করে অরিন্দমদার কাছে এসে তার বাগানের সময় কাটাই এবং হাতে তুলে নিই বেশ কিছু বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা। বাড়িতে ছোট করে হলেও বাগান তৈরি করার জন্যে।

এই কর্মপ্রক্রিয়া যুব সমাজের কাছে আরও এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল যা আগামী দিনে যুবসমাজকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে উজ্জীবিত করবে।

নতুন চিঠি

২২ নভেম্বর, ২০২১

কৃষক আন্দোলন ও মিডিয়া ভাষ্য

গুরু নানকের পুণ্য জন্মতিথিতে আমাদের বাচনতুখোড় প্রধানমন্ত্রী মিডিয়ার সামনে উপস্থিত হয়ে তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন। গত বছরের ২৬ নভেম্বর থেকে জনবিরোধী এই তিন আইন প্রত্যাহারের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছেন কৃষকরা। তীব্র দাবদাহ ঝড়, জল, ঠাণ্ডা অগ্রাহ্য করে পথকেই করেছেন অস্থায়ী ঠিকানা। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতৃত্বে দেশের অন্নতাদাতাদের এই সংগ্রামের প্রতি ন্যূনতম সহমর্মিতা দেখায়নি পুঁজিপতি-দোসর বিজেপি। বরং কুৎসা করেছে, আন্দোলন ভাঙতে বলপ্রয়োগ করেছে। প্রায় সাতশো কৃষক শহিদ হয়েছেন। হুঁশ ফেরেনি পুঁজিদাস প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু মানুষই ইতিহাস রচনা করে। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম মুদ্রণ বা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ধারাবাহিক উপেক্ষা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছে। আসন্ন বিপদ আঁচ করে মানুষ 'দেশপ্রেমিক' বিজেপির পাশ থেকে সরে গিয়ে দেশপ্রেম দেখিয়েছে। নির্বাচনী ফলে হাল খারাপ দেখে মোদীজি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে দলীয় ভাবমূর্তি মেরামত করতে নেমেছেন।

প্রত্যাশিতভাবেই এই ঘোষণা সব সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছে পরদিনই। ৩৫৭ দিন ধরে কৃষকরা যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় লড়াই আন্দোলন চালিয়ে গেছেন সে নিয়ে একটি লাইনও মিডিয়া লেখেনি বা এক মিনিট সংবাদ প্রচার করেনি। অবৈধ সম্পর্ক, ঢেঁকি উৎসব, নীতিহীন দলবদল বা তারকার মাদকাসক্তির খবর দিয়ে মানুষকে বুঁদ রাখতেই তৎপর ছিল মিডিয়া। আজ তাই কৃষক আন্দোলন নিয়ে মিডিয়ার বড় হেডলাইন বা দীর্ঘ ফুটেজ বড় অশ্লীল বোধ হয়। রুটি-রুজির সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে বন্ধ্যা আলোচনাকে 'খবর' বানানো, মোদী মিডিয়ার এই চতুর কৌশল এমনকী সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতির কাছে ধমক খেয়েছে।

তবু সম্বিত ফেরেনি, স্বভাব বদলায়নি। তা না-হলে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের এই জয় নিয়েও মিডিয়া বানানো সংবাদ পরিবেশনের স্পর্ধা দেখায় কী করে। যে তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই আমরণ সংগ্রাম সে তিনটি নিয়ে এরাজ্যে তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থান এক কথায় 'সুচতুর'। আইন যখন পার্লামেন্টে পাশ হয় তখন তার বিপক্ষে ভোট না-দিয়ে তৃণমূল 'ওয়াক আউট' করেছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর যখন কৃষক আন্দোলনের সপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ধর্মঘট হয়, তখন ধর্মঘটকে সমর্থন করা দূরস্থান, এ রাজ্যে ধর্মঘট ভাঙতে সক্রিয় হয়েছে মমতাদেবীর সরকার। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে খাদ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ২০২০ অবিলম্বে লাগু করার সুপারিশ করেছে। অথচ বিজেপি বে-কায়দায় দেখে এরাজ্যের মিডিয়া কৃষকদের এই জয়কে টি.এম.সি-র জয় বলে, অর্থাৎ মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে, মাঠে নেমে পড়েছে। উপায় নেই, হাওড়ার সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেই দিয়েছেন—পজিটিভ সংবাদ ছাপলেই বিজ্ঞাপন মিলবে। শেয়ালকে মুরগি-খামার পাহারা দিতেই হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চ-র সভা মেমারির আমাদপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৯ নভেম্বর : আমাদপুর স্কুল পাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের একটি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সমবায়ী জয়দেব মুখার্জী। মুখ্য বক্তা ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ 'সমবায় বাঁচাও মঞ্চ'-এর বর্ধমান জেলার সম্পাদক দুর্যোধন সর। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় কৃষিকাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মানুষকে সুবিধা দেওয়ার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। বর্তমানে সমবায় সমিতিগুলিতে দুর্নীতির আঁতুরঘর বাসা বেধেছে। রাজ্যের শাসক দলের নেতা নেত্রী এবং এক শ্রেণির সুবিধাভোগী সমবায় সমিতির সদস্যদের বাড়বাড়ন্তে কার্যত দিশেহারা সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাহকরা। একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি কার্যত চোখে পড়ছে, বাম আমলে এই জিনিস চলতো না। কৃষিক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা হলেও চড়া সুদে কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা হয়, কোন ক্ষেত্রে কৃষকরা তাদের সঞ্চয় জমা করলেও নির্দিষ্ট সময়ে সেই সঞ্চয় হাতে ফেরত পান না। তিনি আরো বলেন বাধ্য হয়ে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত কৃষকেরা বিভিন্ন মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে চড়া সুদে কৃষি ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই সুযোগে মাইক্রোফাইন্যান্সগুলির বাড়বাড়ন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক সময়ে ঋণ প্রদান করতে না পারায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কৃষক ও সাধারণ মানুষদের, ঋণের ভারে দিশাহীন হয়ে অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। রাজ্যের শাসক ও একশ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষের জন্য সর্বস্বান্ত হতে বসেছেন প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের কৃষক পরিবারগুলো। প্রায় এক বছর ধরে চলা কৃষকদের যে কৃষি আন্দোলন চলছিল আজ তার শেষ হলো। কৃষকের আন্দোলনের কাছে কার্যত নতি স্বীকার করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কৃষিক্ষেত্রে যে আইন প্রয়োগ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার, তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন দেশের কৃষকরা। দিল্লির বুকে প্রায় এক বছর ধরে দিনরাত ধরে তারা আন্দোলন করেন। শহিদ হয়েছেন অনেক কৃষক। অবশেষে কৃষকদের আন্দোলনের কাছে নত হতে বাধ্য হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শাসক দলের নেতারা সমবায়গুলোকে লাটে তুলে দিয়েছেন।

এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা কমিটির সদস্য সমীর মুখার্জি, সুফল ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় উপস্থিত ছিলেন, কৃষক নেতা জয়দেব ঘোষ, আন্তাজ আলি দফাদার, সঞ্জয় দেব ও অশোক সিং।

বাজার ও দরিদ্র মানুষ ঃ পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

শান্তনু কুমার ঘোষ

চরম আবহাওয়া ও ভারতের আর্থিক ক্ষতি :

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা দেখেছি যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার কারণে ভারতের ব্যঙ্ক ব্যবস্থা বিপুল আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন। ২০১৫ সালে ট্রুকস্ট নামক সংস্থাটি ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে আর্থিক ঝুঁকির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল, বিগত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতির পর্যালোচনা করলে সেই অনুমানের যথার্থতা সম্বন্ধে বোঝা যায়। বর্তমান পর্ব মূলত এই আলোচনার জন্যই উৎসর্গীকৃত।

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), তার ২০২১ সালের প্রতিবেদনে যে আবেদন সকলের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছে, এই পর্বের আলোচনার শুরুতে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের কথা অনুযায়ী, আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম ও আমরা যে সমস্ত ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, এবং যার দরুন আজকের এই জলবায়ুজনিত সমস্যার উদ্ভব—সেগুলির সংশোধন হয়ত সম্ভব নয়; কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানকারী মানুষ ও সাধারণ নাগরিকেরা অর্থাৎ আমরা তো সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি। আমরা সকলে তো পারি, বিশ্বের অতি-উষ্ণায়ণকে বন্ধ করতে এবং সেই সঙ্গে এই বিশ্বকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাম্যের স্থানে পরিণত করতে। সেই সঙ্গে সংস্থাটি এই সংশয়ও প্রকাশ করেছে যে, বর্তমানে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা আছে এবং আমরাও আছি, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান না করলে আগামীদিনে এই সহাবস্থান যে বজায় থাকবে তা কি বলা যায়? এটাকে শুধুই আবেদন হিসাবে দেখা যায় নাকি চরম সতর্কতা হিসাবে গণ্য করা উচিত, তার পর্যালোচনা করা একান্ত আশু কর্তব্য।

ব্রিটেন সরকারের অর্থানুকূল্যে Action on Climate Today নামক সংস্থাটি গঠিত হয় এমনই কিছু প্রশ্নের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ এদেশে উপর্যুপরি ঘটে চলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন প্রাণহানি, শস্যহানি, অন্যান্য সম্পদ ও পরিকাঠামো ধ্বংস হওয়ার ঘটনা সর্বজনবিদিত। এর ফলে ভারতের অর্থব্যবস্থা যে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় এই সংস্থাটির দ্বারা ২০১৯ সালে প্রকাশিত "Assessing India's mounting climate losses to financial institutions" নামক একটি প্রতিবেদন থেকে।

চরম আবহাওয়ার দরুন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কেমন ছিল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বেলজিয়ান সরকারের সাহায্যে স্থাপিত Centre for Research on the Epidemiology of Disasters SCREDV EM-DAT নামক একটি তথ্যভাণ্ডার পরিচালনা করে। সেই সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে উপরিউক্ত প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই তথ্যভাণ্ডার অনুসারে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দুই দশক সময়কালে ভারতে মোট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বাৎসরিক গড় ঘটনা ছিল দশ; অথচ ১৯৯৮ থকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। কেবলমাত্র শেষ দুই দশকে চরম আবহাওয়াজনিত বিপর্যয়ের সংখ্যা ছিল ৩২৮, যার প্রায় অর্ধেকই ছিল বন্যা এবং এই ঘটনাই হল সব চাইতে বেশি আর্থিক ক্ষতির কারণ। যদিও, কৃষিক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় খরার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালে ঘটে যাওয়া একসঙ্গে নয়টি রাজ্যে খরার ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। এর ফলে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ, যার অধিকাংশই কৃষিজীবী, অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত সরকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত সময়-ক্রমিক (time series) তথ্য দিতে সক্ষম নয়। EM-DAT-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে উল্লেখিত সময়কালে (২০০৮-২০১৭) গড় বাৎসরিক আর্থিক

একাদশ পর্ব
(নবম পর্ব হিসাবে বিবেচ্য)

ক্ষতির পরিমাণ ৩০১৫০ (৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০ বছর সময়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ ছয় লক্ষ তিন হাজার কোটি টাকা। অথচ ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হল কমবেশি ষাট হাজার কোটি টাকা। ফলত, ক্ষতিপূরণ পাওয়া তো দূরের কথা, সরকারি স্বীকৃতিটুকুও গরিবের ভাগ্যে জোটে না। সুতরাং, আবহাওয়া পরিবর্তনের খারাপ প্রভাবের জন্য দায়ী যে-ই হোক, দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরাই সেই বিপর্যয়জনিত ক্ষতির সবচাইতে বড় শিকার।

সরাসরি ক্ষতি ছাড়াও, উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস ক্ষতির আরও এক উৎস। ২০০৩-০৪ সাল। হরিয়ানায় তাপপ্রবাহের ঘটনা ঘটে ফেব্রুয়ারি- মার্চ মাস জুড়ে। প্রভাবিত হয় গম উৎপাদন; হেক্টর প্রতি উৎপাদন গড়ে ১৬৯ কেজি কম হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষি। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৭-১৮) অনুসারে যদি IPCC অনুমিত বিশ্ব উষ্ণায়ণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় তবে, কৃষি থেকে বাৎসরিক গড় আয় ১৫-২০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে; সেচসেবিত এলাকার বাইরে এই ক্ষতি আনুমানিক বাৎসরিক ২০-২৫ শতাংশ। স্বভাবতই, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার সমাধান না করা গেলে তার দায় বইতে হবে দরিদ্র চাষিকে। আর এই ক্ষতি পূরণ করা সাধ্যেরও বাইরে; তার কারণ উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বিমার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা দরিদ্র কৃষকের পক্ষে একরকম অসম্ভব।

FAO-এর তথ্য অনুসারে ২০০৫-২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় চরম আবহাওয়া-জনিত কারণে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ; এর মধ্যে ৮০ শতাংশই ভারতের। রাজ্য-ওয়ারি হিসাব ধরলে, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়ে প্রতি পাঁচ বছরে একবার খরার ঘটনা ঘটে। আবার, বিহার ও আসাম প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়ে; অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের সাইক্লোন প্রায় বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এছাড়াও, এই একই সমস্যার সম্মুখীন দেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য রাজ্যগুলি—তথা, পশ্চিমবাংলা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি। ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬-২০১৬ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন এক লক্ষ তের হাজারেরও বেশি গবাদি পশু মারা পড়ে এবং চুয়াল্লিশ লক্ষ হেক্টর জমির চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০১৭ সালের বন্যার কথাই ধরা যাক। সেবছর পশ্চিমবঙ্গ সহ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ বন্যার ঘটনা ঘটে; এবং আলোচ্য প্রতিবেদন অনুসারে এর দরুন মোট ক্ষয়-ক্ষতির আর্থিক মূল্য ছিল পনের শত সাতষট্টি লক্ষ মার্কিন ডলার। যদি এই ক্ষতির এক-তৃতীয়াংশ ভাগ এ রাজ্যের জন্য হয়ে থাকে তবে সেই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক পাঁচ শতলক্ষ মার্কিন ডলারের সমতুল। অথচ, ২০২১ সালের বাজেট বক্তৃতা অনুসারে এই রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (২০১৯-২০ সাল) হল—তের লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচ শত আঠারো কোটি টাকা, আর সারা বছরের ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ হল তিন লক্ষ আট হাজার সাতশো সাতাশ কোটি টাকা। আমরা আগেই জেনেছি যে প্রকৃত ক্ষতির তুলনায় সরকারের ঘোষিত ক্ষতির পরিমাণ মাত্র দশ শতাংশ। তবু সেই ক্ষতির হিসাবটুকু বিবাচনা করলে দেখা যায় যে ২০১৪-১৮ সালে (State Disaster Response Fund (SDRF) এবং National Disaster Response Fund (NDRF) থেকে সমগ্র দেশ জুড়ে দেওয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ষাট হাজার কোটি টাকা (৬০০ বিলিয়ন)। অতএব, চরম আবহাওয়া জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি যেভাবে ক্রমশ বাড়ছে, সরকারের পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো দূরঅস্ত, ক্ষতির সরকারি স্বীকৃতির আশা করাও নিতান্তই কল্পনার বিষয়।

কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি ছাড়া ব্যবসায় সংক্রান্ত ক্ষতির হিসাবটিও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্যদের সম্মিলিত হিসাব অনুসারে ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডের বন্যার দরুন ব্যবসায়িক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক সাড়ে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে যুক্ত হবে বন্যা- পরবর্তী সময়ে লক্ষাধিক মানুষের দীর্ঘকাল কর্মহীন হয়ে থাকা—যার ক্ষতিপূরণ কেউ করবে না। বীমাকৃত ব্যবসার ক্ষেত্রে আনুমানিক মোট প্রায় ৭৩৭০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির মধ্যে মাত্র ৩৩৫০ কোটি টাকা বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয়। স্বভাবতই অধিকাংশ বিমা-বহির্ভূত ব্যবসায়ের ক্ষতির হিসাব কোনও পক্ষেরই বিবেচনার মধ্যে আসেনি। তাই তার ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও অবান্তর।

২০১৪ সালে জম্মু-কাশ্মিরের বন্যায় আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল কমপক্ষে এক লক্ষ কোটি টাকা। ঐ একই বছরে হুদ-হুদ সাইক্লোনের দরুন অনুমিত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭৩৭০০ কোটি টাকা; এর মধ্যে মাত্র ৪৩৫৫ কোটি টাকা পরিমাণ বিমাকৃত ক্ষতি। ২০১৫ সালের মাদ্রাজের বন্যার অনুমিত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৪৭৪০ কোটি টাকা। আবার ২০১৮ সালে কেরালার বন্যায় আনুমানিক ২৮৪৭৫ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির হিসাব পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যেটা সব চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত ক্ষতি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ বেড়েই চলেছে; আর তাতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা সব ক্ষেত্রেই দরিদ্র, কৃষিজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং শ্রমজীবী। কাজেই, এই গরিবনিধন যজ্ঞ অনতিবিলম্বে বন্ধ হওয়া একান্তই জরুরি। সরকারি ক্ষতিপূরণের অন্যতম হাতিয়ার হল তার ব্যাঙ্কব্যবস্থা। ২০১৭ সালে নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী নানান সুরাহার কথা শোনা যায়। সরকার-স্বীকৃত-ক্ষতির পরিমাণই হল ক্ষতি পূরণের ভিত্তি। সুতরাং, বাস্তবে ৯০ শতাংশ ক্ষতি যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে ক্ষতিপূরণ কোনও সমাধান নয়। তাছাড়াও, ব্যাঙ্কঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি আসলে অনাদায়ী ঋণের অপর নাম। কাজেই এভাবে priority sector-এর তকমা দিয়ে সমস্যার লোকদেখানো সমাধান কোনও কাজের কথা হতে পারে না। প্রয়োজন স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটা। সেক্ষেত্রে, IPCC-উচ্চারিত সতর্কবাণীই আমাদের কাছে আলোকবর্তিকা হতে পারে। পূর্বে উল্লেখিত IPCC–র সেই সতর্কবাণী আমরা মনে রাখতে পারব তো?

অন্য সংস্কৃতি

খুদুমনির ঘর-বাহির

তপোময় ঘোষ

বাগদি পাড়ার খুদুমনি মাঝি বিজয় বাগদির বিধবা বউ। অন্তত পনেরো বছর আগে সে বিধবা হয়েছে। তারপর থেকেই সে অনাথা, অসহায়, তার থাকার একখানা কুঁড়ে আছে। লোকমুখে শুনেছে তার ঘর বেরোবে। ঘর থেকে সাপ বেরোনো ইঁদুর বেরোনো শুনেছে খুদুমনি। কিন্তু আস্ত ঘর কিভাবে বেরোবে সে ও অনেকদিন বুঝতে পারেনি। পরে বুঝেছে, ঘর বেরোবে মানে ঢুকবে, ঢুকবে মানে টাকা ঢুকবে তার ঘরে নয়, ব্যাংকের একাউন্টে পাকা ঘর করার জন্য। এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা। মাস তিনেক আগে সেই টাকা ঢুকেছে। এখন শুনছে এক লাখ কুড়ি ফুরি নয়, দিয়ে থুয়ে লাখ খানেক টাকা সে পাবে। তাও একবারে নয়, দু বারে দু কিস্তিতে। প্রথম কিস্তির টাকায় ইঁট বালি তুলতে হবে। সেটা দেখে পঞ্চায়েতের প্রধান লিখে দিলে তবে আবার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবে। তার আগে পার্টির লোকদের পাঁচ হাজার দিতে হবে কাউকে না জানিয়ে। তবে পার্টির লোক বলেছে এটা চুরি নয়, ঘুষ নয়, ওটা দিতে হয় এমনি। আমরা তো চেয়ে নিচ্ছি। চুরি করলে কেউ চেয়ে নেয়? ওই ৫০০০ টাকা সবাই দিচ্ছে তুমিও দেবে।

খুদুমনির একটা মেয়ে আছে। বছর ২০ আগে ঘোষপাড়ায় তার বিয়ে হয়েছে। জামাইয়ের নাম বাবলু সর্দার, মাধ্যমিক পাশ। বিজয় মাঝি মেয়ের বিয়েটা দিয়ে নাতির মুখ দেখেই মরেছে। মেয়ে শেফালী এখন সুখে ঘরকন্না করছে। নাতি জিতকে নিয়ে খুব গর্ব খুদুমনির। এখানে খুদুমনির এক দেওর ও তার দুই ছেলে জগাই মাধাই আছে। তারা খুদুকে 'বড়মা' বলে সম্মান দেয়। শুধু জা-মাগীটা হিংসুটে। খুদুমনির বাড়ির দাগনম্বর ৬৬২, পরিমাণ দু-শতক মানে এক কাঠা। বাড়ির পজিশনটা খুব লোভনীয়। একদম বাগদিপাড়ার মাঝখানে বেজা বাগদির বাড়ি। দুদিকে পঞ্চায়েতের বড় রাস্তা। চৌকো প্লট। এখন একখানা খড়ের চালের কুঁড়ে আছে দক্ষিণ দুয়ারী। এটা ভাঙতে হবে সবাই পরামর্শ দিয়েছে। ওই দক্ষিণ দুয়ারীই করতে। ওই টাকায় কি পাকা ঘর হবে গো? ও টাকাটা ভিতেই ঢুকে যাবে।

খুদুমনি টাকা পেয়েছে। কিন্তু ঘরটা করবে কে? সে তো আর করতে পারবে না, করবে তো রাজমিস্ত্রিতে। রাজমিস্ত্রি চয়েস করাই কঠিন। তবে পাড়ার অনেক পাকা ঘরই করেছে সোনারুন্দির বকুল মিস্ত্রি। ছেলেটা ভালো। কাজও ভালো। ঝরঝরে। কিন্তু খুদুমনি তো একা ঠিক করতে পারবে না। জামাই বাবলু, প্রধান শ্যামাপদ—এদের মতামত নিতে হবে।

প্রধান শ্যামাপদ ঘোষ অবশ্য ইতিমধ্যে বার পাঁচেক খুদুমনির বাড়িতে এসেছে। বেজা বাগদির বউটা বড্ড বেগ দিচ্ছে একদিন। আজ একবার ডাকতে গেলো খুদু। শ্যামাপদ আগের টার্মে উপপ্রধান ছিল, এই টার্মে প্রধান হয়েছে। হয়েছে মানে ঠিক নির্বাচিত নয় অনেকটাই টাকা-দিয়ে-কেনা। বেশ কিছু টাকা খরচ করেই পদটা কিনেছে ঘোষ মশাই। পার্টির সভাপতি বলেছিল, আমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। তারপর তুমি যেভাবে হোক ওই টাকা তুলে নেবে, আমরা আর তাকাবো না। সেই হিসাবে টুকটাক কামাই করছেও বটে শ্যামা ঘোষ। এবার এই পঞ্চায়েতে ৬৮ খানা ঘর বেরিয়েছে। তার মধ্যে চল্লিশ খানা ঘরের মালপত্র সাপ্লাই দিচ্ছে শ্যামা ঘোষের ভাইপোদের দোকান 'ঘোষ হার্ডওয়ার'। ভাইপোদের ব্যবসাটাও দাঁড় করিয়ে দিতে পারছে।

বকুলকে ফোন করেছিল বাবলু। আজ বিকালে আসবে। বাবলু আর প্রধান থাকবে, থাকতে বলেছে জগাই মাধাইকেও। ঘরের জায়গার চারিদিকটা দেখে বকুল মিস্ত্রি বললো, যেভাবেই ঘর করো কাকিমা, এই টাকায় তোমার ঘর হবে না। যেভাবেই ঘর করো লাখ চারেকের কমে হবে না, কতো ঢুকেছে তোমার। বাবলু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো, লাখখানেক ধরুন। আরো তিন লাখের ব্যবস্থা করো। —তিন লাখ টাকা কি যোগাড় করা সম্ভব গো? অত হবে না। তবে আরো লাখ দেড়েক টাকা যোগাড় করে দেবো যাও। ভিত কাটতে লাগো। সুযোগ পেয়ে শ্যামা ঘোষ বললো, দেখো জামাই, দেড় লাখ যোগাড়ের দায়িত্ব তুমি নিলে। এই পাঁচজনের সামনে কথা দিলে। তাহলে মিস্ত্রি, আড়াই লাখের মধ্যে যাতে হয় তেমনই ফাঁদো।

জায়গা যত ছোটই হোক না কেন, খুদুমনি চাইছে ছোট ছোট দুটো খোপ করতে জামাই মেয়ে এসে একটায় থাকবে। আর ও নিজে একটায় থাকবে। ও তো আর এখনই মরছে না। নতুন ঘরে ক'বছর বসবাস করবে, তারপর মরবে এই আশা।

বাবলুর হাতে বালতিতে গুঁড়ো চুন। মিস্ত্রি বকুল দড়ি ধরে খুঁটি পোঁতে তো সঙ্গে সঙ্গে বাবলু চুন দিয়ে চিহ্নিত করে। যে দুটো দক্ষিণ দুয়ারী ঘর চিহ্নিত করার পর পরও পূব দিকে আর দক্ষিণ দিকে বেশ কিছুটা জায়গা পড়ে থাকছে। দুদিকেই বড় রাস্তা। রাস্তার ধারে এতটা জায়গা দেখতে পেয়ে প্রধান শ্যামা ঘোষের চোখ চকচক করে উঠল। কারণ তার ভাইপোরা এরকম একটা জায়গা অনেকদিন ধরে খুঁজছে। গাঁয়ের ভেতরে শোরুম করবে বলে। তাদের ব্যবসা এখনও গাঁয়ের বাইরে সে-ই বড় রাস্তার ধারে। তাদের ব্যবসা বাড়ছে। সুতারাং, এখন গাঁয়ের ভেতরেও একটা কাউন্টার খুলতে হবে। আবার বড়মায়ের পাকা ঘর হবে। সীমানা দেখে নিতে জগাই-মাধাই ও এসে তখন থেকে দেখে নিচ্ছে সীমানা। বিশেষ করে তাদের দিকটা। তারাও দু'ভাই যে জায়গাটায় তাদের ঘর আছে। সেটুকু দুভাগ হলে, তাদেরও ঘুরে দাঁড়াবার জায়গায় কুলোবে না। জেঠিমার ওই ফাঁকা প্লটটা পেলে তাদেরও ভালো হয়, এক লাগোয়া হয়ে যায়। দরকারে তারা টাকা দিয়ে কিনেও নেবে জেঠিমার কাছ থেকে রেজিস্ট্রি করে।

সব শুনেটুনে জামাই বাবলু বলল, আরে বাঁশ কঞ্চিগুলো খুলে এখন উঠানে জড়ো করে রাখো। পরে ঠিক করা যাবে, কী হবে। জগাই মাধাই বললো, জামাই বাবাজীবনের ধান্দা আছে ওগুলো বাড়ি নিয়ে যাবার। শেফালী বলল, আমাদের বেগুনের ভুঁইটা ঘেরা হবে পরে নিয়ে যাবো। ঠিক হলো, পাড়ার খগেন দাসকে মুনিশ হিসাবে নিয়ে পুরনো ঘরের চাল ছাড়ানো দেয়াল ভাঙ্গা হবে। পরদিন থেকে খগেন কাজে বহাল হলো। এর মজুরি খুদুমনিকে দিতে হবে, প্রথম দিনেই চাল উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আজ দ্বিতীয় দিন আজ দেওয়াল ভাঙার পালা ছিটেবেড়ার বেড়ায় কাদা ধরিয়ে দেওয়াল।

প্রধানের ভাইপোরা তাদের দোকান থেকে শিক-সিমেন্ট-তার-পেরেক পলিথিন দিলেও ইঁট তারা দেয় না। ইট তারা ঠিক করে দিয়েছে আঙারপুর এর 'স্টার ভাটা' থেকে। সেখান থেকে অজয়ের ব্রিজ পেরিয়ে ট্রাক্টরে ইঁট আসে। ট্রাক্টরটা অবশ্য বলেছিল এক নম্বর ইট দেবে, জেঠি তুমি দেখে নেবে, এক নম্বর না হলেই গাড়ি ফেরত পাঠাবো।

প্রধানের ভাইপোদেরই নতুন ট্রাক্টর, ড্রাইভার ও নতুন আদিবাসী পাড়ার লদাই কোঁড়ার ছোটছেলে দুকো কোঁড়া বেটা বদমাইসের এক শেষ। বদমাসকে খুদুমনি বলে বেদো। তো দুকো বেদোটা বড় রাস্তার ধারে খুদুমনির

ছোটগল্প

বাড়ির মোড়ে ইঁটগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। অতদুর থেকে রাজমিস্ত্রির যোগাড়েরা আনতে পারে না। আজ ভোর থেকে তাই খুদুমনি একখানা একখানা করে সেই ইঁট বয়ে এনে নিজের ঘরের পাঁদারের কাছে রাখছে। ওরা বলেছে প্রতি গাড়িতে দের হাজার ইট আসছে। খুদুমনি অত হাজার দেড়হাজারের হিসাব বোঝে না। সে বোঝে কড়া, গণ্ডা, পন কুড়ি গণ্ডা মানে আশিটা। একপন হিসাবের সুবিধার জন্য খুদু পরে পরে চারখানা করে ইঁট একেক বারে আনে। এতে হিসাবের সুবিধা। কুড়ি গণ্ডা হলেই একমুঠো বালি রেখে দেয় সার করে। শেষে কত মুঠো বালি হয় গুনে নেবে। নাতি জিৎও একসময় হাত লাগিয়েছে। সেও দিদিমার সমানে সমানে বয়ে চলেছে। গুনে দেখা গেল ওরা প্রায় চার পন ইঁট ইতিমধ্যে বয়ে ফেলেছে। নাতি গুন করে বলল, এতক্ষণে মাত্র তিনশো কুড়ি খানা এলো এখনো অনেক বাকি।

খুদুমনির ঘর ও ঘরের মালপত্র দেখতে একদিন বেনেদের বড় ভাই বাবন চন্দ্র এলো। উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, কই রে শেফালী একটা কাচের গ্লাস দে দেখি। শেফালী তাড়াতাড়ি একটা কাচের গ্লাস তার হাতে এনে দিলে সে বলল, একটু জল দিবি না? দে একটু পরিষ্কার কলের জল। শেফালী তা ও দিল। এবার বাবন বেনে জিতকে বলল, ভাগ্নে, ওই বালি একমুঠো আনো তো। জিৎ বালি নিয়ে এলে বাবন বলল, দাও এই জলে।

জিত জলে বালি ঢাললো বাবণ গ্লাসটা নাড়লো, অমনি গ্লাসের জল ঘোলা হয়ে গেল। বাবন গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে বলল—উ উ উ এই দেখেছো! কই গো খুড়ি দেখে যাও তোমার বালির নমুনা, দেখ রে শেফালি এই বালিতে কত কাদা, কত পলি। দেখলি তোর জল তো পরিষ্কার ছিল ছিল। কাদা তো ছিল না। তাহলে এই কাদা এল কোথা থেকে? জিৎ বলল নিশ্চয় বালি থেকে। তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বেনের ছেলে বলল সাবাশ ব্যাটা! ঠিক বলেছিস, এই বালি অজয়ের চর থেকে এনে ঢেলে দিয়েছে। এতে গাঁথলে ঘরে ডাম্প ধরবে মানে নোনা ধরবে বুঝলি। খুব সাবধান। আর তোদের ইঁটতো এক নম্বর নয় মনে হচ্ছে। খুদুমনি বলল, তা'লে বাপনকে বলি, ফেরত নিয়ে যেতে। পাল্টে দিয়ে যাবে। হ্যাঁ তাই বলো। এই বলে হন হন করে বাবনবাবু চলে গেল। শেফালী বুঝল ওদের দোকান থেকে মালপত্র নেওয়া হয়নি বলে এমন করে বলে গেল দাদা।

মেজের লেভেলের ব্যান্ড ঢালাই হয়ে গেছে গত পরশু। এবার দেওয়াল তরতর করে উঠছে। বকুলের মিস্ত্রিরা কামাই করে না, দ্রুত গাঁথছে। খুব তাড়াতাড়ি লিন্টেন ঢালাই হবে। দরজা-জানলা এঁটে যাবে। দিন পাঁচেকের মধ্যে ছাদ ঢালাই হয়ে যাবে বলে জানালো হেড মিস্ত্রি বকুল। সেই মতো খুদুমনি মনে মনে সাজছে। এলাকায় রেওয়াজ আছে ছাদ ঢালাইয়ের দিনে মিস্ত্রি মজুরদের দুপুরের খাবার দিতে হয়। মানে ছোটখাটো ভোজ আর কি! পাড়ার সবাই যাদের এর আগে ঘর হয়েছে, সবাই যার যেমন সামর্থ্য লোক খাইয়েছে। কেউ কেউ তো রীতিমতো পাড়ার লোককে শুদ্ধ খাইয়ে ভোজই করেছে। সুতরাং খুদুমনিকেও খাওয়াতে হবে। মন তার হরিষ বিষাদে পূর্ণ। হরিষ এজন্য যে, তার বহুদিনের প্রত্যাশা ছাদের ঘর। তার সেই ছাদ হচ্ছে। আর বিষাদ এজন্য যে, হাতে একদম কিছু নেই। কী দিয়ে এই আনন্দের উদ্‌যাপন করবে। ক'জন লোক কীভাবেই বা খাওয়াবে?

পুরনো মরচে পড়া টিনের সুটকেসটা বের করে আনার উদ্যোগ নিল যেন। জীত ও কৌতুহলী এই স্যুটকেসে কী আছে দেখার জন্য। সব শুনেটুনে খুদুমণিরও মনে পড়ল এই ছোট বাক্সটার কথা। ছিল তো অনেক কিছুই, সে সব কথা কি আর সব মনে আছে! দেখা যাক। খুদু বাবলুকে বলল, তা বার করে আনো দেখি কী আছে কী নাই। রেখেছিলাম তো অনেক কিছু, সেসব কি আর আছে। জিৎ হঠাৎ একটা হাঁড়ি এনে দেখলো তাতে অনেকগুলো কাগজের মধ্যে ছোট্ট একটি রেশন কার্ড মানে ডিজিটাল রেশন কার্ড। পড়ে দেখলো, হ্যাঁ নাম লেখা খুদুমনি মাঝি স্বামী বিজয়। এই তো! দিদার রেশন কার্ড। শেফালী দেখেই বললো—মা, এইতো তোমার কার্ড। চলো, ডিলারের কাছে যাই। আজ তিন মাস তোমাকে চাল গম দেয় নাই। চলো সেই চাল গম আদায় করে আনি। যেন মা মেয়ে যুদ্ধে চলল।

জয় কৃষাণ

রমাকান্ত পাঁজা

কী ভেবেছিলে তোমরা
থামিয়ে দেবে নাকি সব!
কাস্তেটাতে শান দিয়েছি
থামাবো গুলির কলরব।

পিছনের দরজায় আইন করেছিলে
মোসাহেবরা তুলেছিল হাত,
সত্যের পথে সদর দরজায়
করেছিলাম জোড়ে করাঘাত।

দরজা তোমায় খুলতেই হলো
হেঁট করতে হলো সেই মাথা,
তবু কেনো তুমি শেষ করলে
সাতশো একাত্তর অন্নদাতা।

কি অমানবিকতা পরিযায়ীদের সাথে,
ভুলিনি—বেকারিত্ব, নোটবন্দি,
কর্পোরেটদের লুট করতে দিয়েছো
সম্পদ বিক্রির করেছো ফন্দি।

সংবাদ মাধ্যমকে কলুষিত করেছো,
পড়েছিলে তো কোরান, গীতা,
বুঝতে পারোনি প্রশ্ন আসবে
তোমারই 'প্রিয় অন্নদাতা'।

এই তো সবে শুরু হলো
এখনো তো অনেক বাকি,
ঐক্যের মুঠিতে ছিঁড়বে মুখোশ
পরেছো যেটা, সেটা মেকি।

নির্মম স্মৃতি

শম্ভু ঘোষ

কমরেড উদয়
জানতাম কমিউনিস্টরা
কথার খেলাপ করে না
কিন্তু কেন করলে তুমি
এটা কি উচিত হলো?

মরনোত্তর দেহদানের
অঙ্গীকার করা আছে আমার
দায়িত্ব নিয়েছিলে দেহ
যথাস্থানে পৌঁছে দেবে।

আমার পুত্র সন্তান নাই
দাদু বলতে তুমি আমায়
নাতির অধিকার বলেই
বর্তেছিল ঐ দায়িত্ব।

অগ্রাধিকার ছিল আমার
পূর্বেই তুমি চলে গেলে
বর্ধমান মেডিকেল কলেজে
রেখে গেলে নির্মম স্মৃতি।

আন্দোলন ব্যর্থ হয় না

অজিত সাঁতরা

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা
সংঘবদ্ধ আন্দোলন
বাতিল করালো কালা আইন
দু'বছর ধরে জীবনপণ।

রোদে জলে দিনে রাতে
পুরুষ মহিলা বাচ্চা সাথে
আন্দোলনে অটল অচল
খোলা আকাশ ফাঁকা রাস্তাতে।

অনেক প্রাণের হল অবসান
বহু পরিবারে চোখের জল
কৃষক বিদ্রোহ করাল বাতিল
আন্দোলনের এটাই ফল।

ইতিহাস যে কথা বলে
হইল সাক্ষী ভারতবাসী
অন্যায়টা হারিয়ে দিয়ে
আন্দোলনকারীর মুখে হাসি।

আকাশ

অভিজিৎ মিত্র

কলকাতা আর মোল্লাহাটের আকাশ কি আলাদা?
গুজরাট আর সেকেন্দ্রাবাদের?
কে যেন অর্বাচীন মাইক বাগিয়ে গলা ফোলাতে গিয়েও হোঁচট খেল
এক ঝলক আকাশের সঙ্গে চোখাচুখি
কোথাও কাঁটাতার নেই
পাসপোর্ট ভিসার চোখরাঙানি নেই
লাল বা সবুজ রঙের টিপ স্ট্রোক নেই
আশ্বিন বাজলেই আকাশের এপাড় ওপাড়ে
যতদূর নীল আকাশ কিউমুলাস ডানা

আমি শুধু আকাশে মুখ তুলে রসদ খুঁজি
প্রতি শ্বাসে এক মুঠো বেঁচে থাকার গল্প
প্রতি শ্বাসে মন আরেকটু বড় করে
মানুষ শব্দের যত কাছাকাছি
অথবা আরেকটু ওপরে পাখির মতো

মেমারি-তারকেশ্বর ১৩ নম্বর রাজ্য সড়কে কাদার চাঁই! সমস্যায় যানবাহন ও পথচারীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৮ নভেম্বর : ধানকাটা মেসিন ও ট্রাক্টরে জমির ভিজে মাটি উঠে আসছে রাস্তাতে। সারিবদ্ধ ভাবে পড়ে রয়েছে কাদামাটির চাঁই। ফলে সমস্যায় পড়েছেন যানবাহন চালক থেকে স্থানীয় পথচারীরা। মেমারি-তারকেশ্বর ১৩ নম্বর রাজ্য সড়কের ঘটনা। ১৮ নভেম্বর সকালে এই ছবি দেখা যায় মেমারির পারিজাতনগর সংলগ্ন ডাক বাংলো পাড়া থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত এভাবেই বিস্তৃত রয়েছে মাটির চাঁই।

যেকোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্থানীয় মানুষজন সহ অন্যান্য গাড়ি চালকরা।

মেমারি চকদিঘী মোড় থেকে মশাগ্রাম এর কাছে ১৩ নম্বর রাজ্য সড়কে সঙ্গে সংযোগ রয়েছে দু নম্বর জাতীয় সড়কের। ফলত রাস্তায় যানবাহনের চাপ অনেকটাই বেশি। একইসঙ্গে মেমারি-তারকেশ্বর, মেমারি-নবদ্বীপ, মেমারী-বর্ধমান, কৃষ্ণনগর-তারকেশ্বর সহ মেমারি-জামালপুর, মেমারি-জৌগ্রাম রুটের একাধিক যাত্রীবাহী বাস ও ট্রেকার চলাচল করে। পাশাপাশি রাতের দিকে অন্যান্য যানবাহনের চলাচল বাড়ে। অথচ এভাবে রাস্তার উপরে কাদার চাঁই পড়ে থাকায় বিপদের আশঙ্কা প্রহর গুনছেন গাড়ি চালকরা।

উল্লেখ্য, সময়ের সাথে চলতে গিয়ে বেড়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশের চাহিদা। কাজ হারিয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত একাধিক শ্রমিকরা। এই ধান কাটার মরশুমে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ধান কাটার কাজ করতে আসতেন শ্রমিকরা। কিন্তু অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশের চাহিদায় আজ কাজ হারিয়ে তারা দিশাহীন।

জয় গণতন্ত্রের, উৎসবে কৃষকরা

—প্রথম পাতার পর

চালিয়ে এসেছেন কৃষকরা। বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তারা। তা সত্বেও লক্ষ্যচ্যুত হননি। দিল্লির উপকণ্ঠে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা উপেক্ষা করে আন্দোলন চালিয়েছেন।

তিনি বলেন, ''কৃষকদের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরাও মাঝেমাঝে কৃষকদের সমর্থনে হাজির হয়েছি। সেখানে কৃষক আন্দোলনে অংশ নিয়ে দিনের পর দিন অবস্থান বিক্ষোভে থেকে প্রাণ হারিয়েছেন অনেক কৃষক। আজকে এই বিল প্রত্যাহারের দিনে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।''

অমল হালদার বলেন, ''আজ নরেন্দ্র মোদি সরকার ঘোষণা করেছেন কৃষি বিল প্রত্যাহার করা হবে বলে। আমরা চাই দ্রুত অর্ডিন্যান্স জারি করা হোক। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে ২০১৪ এবং ২০১৭ সালে যে আইন তারা করেছিলেন তা প্রত্যাহার করতে হবে।''

সিপিআই(এম.এল) লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের কথায়, ''কৃষক আন্দোলনের বড় জয়। গত এক বছর ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কৃষকরা আন্দোলন চালিয়ে এসেছেন। অন্তত ৭০০ কৃষকদের প্রাণের বিনিময়ে আজকের এই বড় জয় তারা অর্জন করেছেন। যদিও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে মোদি সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা স্পষ্ট।''।

এর পাশাপাশি এদিন কৃষি-আইন বাতিলের ঘোষণায় কৃষকদের সম্মান জানিয়ে এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে কার্জন গেট চত্বরে সভা করা হয়।

এক বছর ধরে দিল্লির রাজপথে ভারতের কৃষকরা শুধু বৃষ্টি নয়, প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও এমনকি জলকামান-লাঠি-কাঁদানে গ্যাসের মধ্যে পড়ে থেকেও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করলেন। এই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে যে ৬৭৫ জন কৃষক শহিদ হয়েছেন তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আগামী দিনে ভারতবর্ষকে বেচে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং মানুষের পাশে থাকার সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে আরো দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার করে ২০ নভেম্বর গুসকরা স্টেশনচত্বরে পথসভায় একথা বলেন বর্ধমান জেলা কৃষক নেতা রবীন টুডু।

এর আগে কৃষক ও খেতমজুরদের এক মিছিল গুসকরা শহরের হাটতলা, ক্ষেত্রপালতলা, রেল ফটক সহ বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। উক্তা, বেরেন্ডা, ভেদিয়া, গুসকরা-২ দিগনগর এবং শহরের শ্রমজীবী মানুষ এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা আলমগীর মণ্ডল।

পুতুল নাটকের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শিশুদিবস উপলক্ষে ১৪ নভেম্বর টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয় 'বর্ধমান দি পাপেটিয়ার্সের' পুতুল নাটক 'নীলবর্ণ শেয়াল'। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী ক্ষীরোদবিরোহী ঘোষ। প্রবেশের মুখেই ছিল শিশুদের যেমন খুশি আঁকোর ক্যানভাস। ৫০ শতাংশ দর্শকের উপস্থিতিতে অষ্ঠানটি হয়।

প্রান্তজন—আত্মজন (২৯)

রত্না রশীদ

আগের দিন শুরু করেছিলাম এই বলে যে, মানুষ দারিদ্র্যকে ভয় পায় না। কিন্তু কেন, তার ব্যাখ্যা করে উঠতে পারিনি। আজও পারবো কিনা জানি না, তবে কথাটা মাথার থেকে মোটে বেরোচ্ছে না।

আমরা বড়ো হয়েছি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিসরে। আমার বাপির একটা যথেষ্ট ভালো কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি ছিলো, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল অনেক অনেক অসংসারীয় দায়দায়িত্ব, ভালোবাসার দায়। আমি এখানে বাপির গুণগান গাইতে বসিনি। সেই সময়কালের একটা সত্যনিষ্ঠ ছবি তুলে ধরতে চাইছি। এখনকার তুলনায় মনে হয় সেটা সত্যযুগ ছিল।

একই সরকারি চাকুরে হলেও সবার বেতন সুযোগ-সুবিধা সমান ছিল না—এটা বলাটাও বোধহয় বাহুল্যই হলো। এর ওপর ছিল একেকজনের সংসারের এক-একরকম আয়তন। আমি তখনি দেখেছি, যাদের আয় যতো কম তাদের সন্তানসংখ্যা ততো বেশি। আমাদের একদম পাশেই আচার্য্যি জ্যেঠুরা ছিলেন। সত্যিকারের সজ্জন মানুষ। কিন্তু অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, আয় কম। প্রায়ই দেখতাম, সামনের মাঠের পাশ থেকে কচুর শাক কেটে আনছে আর শুধু ওই দিয়েই ভাত। রাতে ওরা ভাতের ফ্যান না ফেলে নুন দিয়ে শুধু ফ্যানভাত খায়। ওই একই র‍্যাঙ্কে চাকরি করা অন্যজনের পরিবারে মাত্র দুই ছেলে-মেয়ে বলে ওদের কতো ফাঁট ডাঁট দেখানেপনা। বলতে পারবো না অন্য আরো কোনো কারণ ছিল কিনা। আমাদের ছোটোবেলায় এসব দেখানেপনা নিন্দনীয় ছিল। কারোর সামনে সাজিয়ে গুছিয়ে একলাটি খেতে বসা, অসভ্যতা বলে গণ্য হতো। এখন তো এসব বাহাদুরি।

সেই ছোটেবেলাতেই আমরা ভাই-বোন আনন্দ করতে কুঁকড়ে থাকতাম। কেউ কোনোদিন বকেনি আমাদের আনন্দ-স্ফূর্তির ব্যাপারে। কিন্তু আশপাশের পরিবেশের চেহারা চরিত্র দেখে, মনে মনে কষ্ট পুষতাম। ওখানে কেউ আনন্দের ফুলঝুরি ওড়াতো না, তা কিন্তু নয়। কিন্তু কেন জানিনা আমরা দু-ভাইবোন চুপচাপ মাথা হেঁট বাড়ি ফেরত আসতাম। দিদা বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতো। দু'ভাইবোনকে দু'হাতে বুকে আঁকড়ে জিজ্ঞেস করতো—

—ফিরে এলে কেন তোমরা?

—ওরা খুব আনন্দ করছে, আমাদের ভালো লাগলো না।

—কেন? জীবনে আনন্দ করা ভালো তো! তোমরাও করো।

—না। অনেকে ছেঁড়া জামা পরে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

—হুঁ। বুঝলাম। কষ্ট হয় তোমাদের। কিন্তু তবু তো তারা ওই আনন্দে আছে। তোমরা বাড়ি চলে এলে কেন?

—কান্না পাচ্ছিল। লোকে হাসবে তাই...

—ও সোনামণিরা আমার! হাসার মানুষজন নিজেরা বোঝে না কেন তারা হাসে। তোমরা কষ্ট পেয়ো না সোনা। পৃথিবীটা এমনই। দুঃখ কষ্ট তো থাকবেই, তা বলে তোমরা আনন্দ করবে না?

—করতে তো চাই দিদা—কিন্তু কান্না পেয়ে যায়।

—কেঁদো না সোনা। একটা দুটো সন্তানের পেট ক্ষীর দিয়ে ভরানো যায়, অনেক সন্তানের মুখ বালি দিয়েও ভরানো যায় না সোনা। এটা সংসারের নিয়ম।

—কেন এমন নিয়ম হবে? কেন একজন লোক দেখিয়ে আনন্দ করবে; আর অন্যেরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে? আমরা কোনোদিন সবার সঙ্গে একসঙ্গে আনন্দ করতে পারবো না?

□

আমি জানি না, এখনো জানি না আমি বা আমাদের এই সাধ কবে পূরণ হতে পারবে। বড়ো কিছু করার সামর্থ্য হয়নি কখনো। কিন্তু সেই ছেলেবেলাতেও কোনদিন কাউকে কিছু দেখিয়ে আড়ম্বর করতে নিজে নিজেই লজ্জা পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি। আমাদের বাড়িতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনোদিন কিছু আসতো না, দৈবাৎ ভুলক্রমে বাড়তি কিছু এসে গেলে, অভাবী মানুষজনকে দিয়ে দেওয়া হতো। তাই বাড়তি কারো কিছু থাকতো না। পুজোর সময়েও একটা জামা, একটা প্যান্ট নতুন পেতাম। রেল কোয়ার্টারের সব ছেলেমেয়ের একটা করে নতুন জামা প্যান্ট হতো। তাই সবার সামনে আনন্দে পুজোটা সত্যি পুজো হয়ে উঠতো। কিন্তু পাড়াতেই ঠাঁট বাট দেখনদারির মানুষও তো ছিল। দেখতাম আমার ছিটের কমদামি জামাপরা বন্ধুরা তাদের দেখলে, সমবয়সী হলেও, কেমন কুঁকড়ে যেতো। তাদের সঙ্গে মণ্ডপে যেত না। অথচ আমাদের সঙ্গে সবার গলায় গলায় বন্ধুত্ব। আমাদের বাদ দিয়ে ওরা মণ্ডপে যাবেই না। তখন, ওই ছেলেবেলাতেই বুঝতে পেরেছি, মানুষ দারিদ্র্যে ডরায় না, কেবলই বৈষম্য ভাঙে বুক।

এসবের জন্যে না আমি পুজোয় আমার বাড়িতে পাওয়া একটা মাত্র কমদামি জামা পরেই পুজো কাটাতাম। রোজ ওই একটাই জামা পরে পুজো দেখতে কী অসুবিধে! মামা, জ্যেঠু, পিসিমা তো পুজোয় একটা একটা করে জামা দিতোই, সব মিলিয়ে আমাদের তিন-চারটে পাঁচটা জামা হয়ে যেতো। কিন্তু পুজোয় পরতাম একটাই। মামা-মামি দেখলে রাগ করতো, কিন্তু আমি কী করবো! আমার বন্ধুদের আগে পাঁচটা করে হোক জামা, তারপর একসঙ্গে পরবো। লজ্জা লাগতো আমাদের। একবার পিসিমা নিজে হাতে মেশিন চালিয়ে সোনালি রঙের সার্টিনের ফ্রক করে আমাকে দিয়েছিল পুজোতে। বাড়ি তো বটেই পাড়াসুদ্ধ লোক বলছিল,

—ওরে এটা তো সোনার জামা!

কিন্তু আমার বন্ধুদের মুখে হাসি থাকলেও, চোখগুলো কেমন কান্না কান্না লাগছিল। ওদের কারো এতো ঝকমকে জামা নেই যে!

মা, দিদা জানতো আমি এই জামাটা পুজোতে মোটেই পরবো না। শেষকালে বাপি একটা পথ বাতলালো—

—শোন, পিসিমার দেওয়া জামা না পরলে পিসিমার অপমান হবে। জামাটা পুজোতে তোকে পরতে হবেই। না-না অতো কান্নাকাটির কিছু নেই, তুই একা পরতে চাসনা তো, তোর কথাই থাক। জামাটা তোর বন্ধুদের সঙ্গে তুই পালাপালি করে পরবি দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো হয়ে কালীপুজো পর্যন্ত। কী খুশি তো!

এই না আমার বাপি! ওই সার্টিনের জামাটা বারোয়ারী জামা হয়ে গেল। যার যখন ইচ্ছে তখন পরবে। পুজোতে তো বটেই, কারো বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাবার থাকলে, আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যেতে হলে, যখন যেমন যার ইচ্ছে। গরিব ছিলাম সবাই। তবে দেখুন দারিদ্র্যে কেউ কষ্ট পায় না। পায় শুধুমাত্র বৈষম্যে। সবাই মিলে একমনা হলে, কোনো দুঃখ নেই। বুঝেছি সেই ছেলেবেলায়, বই পড়ে নয়।

(চলবে)

অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা

—প্রথম পাতার পর

হলো না! দ্বিতীয়বার ধান রোপণ করে, বাড়তি খরচ করেও মিলবে না লাভের কড়ি। সৌজন্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়!

মেমারি-১ নম্বর ব্লকের, পারিজাত নগর, বহেরা, বাগিলা দেবীপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় চলছে ধান কাটার কাজ। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য মাঝপথেই থমকে যায় ধান কাটার কাজ। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এলাকার চাষিরা। সূত্রে জানা যায়, ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টরের বেশি গোটা জেলা জুড়ে ধান চাষ হয়েছে। আর ২৬ থেকে ২৭ মিলি লিটার জল ২৪ ঘণ্টায় হয়েছে।

অপর দিকে মেমারি দু'নম্বর ব্লক এর কুচুট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কুচুট, বড়মসাগড়িয়া, বড়গ্রাম সহ বিভিন্ন এলাকায় টানা বর্ষণে আবারো ক্ষতির মুখে কৃষকরা ধান মাঠ থেকে তোলার ব্যাপারে। কৃষিক্ষেত্রে বারংবার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কৃষকরা তারা চাইছেন রাজ্য সরকার তাদের দিকে নজর দিন। কৃষকের পাশে সরকার নেই।

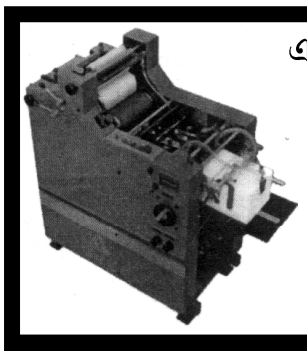

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা